কারা কথা

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' –অতি বিখ্যাত একখানি 'স্বাধীনতা-স্বপ্নের' বই। নবীন পাঠকরা বহুজনই পড়ার সুযোগ হয়তো পাননি। লাইব্রেরী থেকে জরাজীর্ণ বইটি পড়ে – ক'টি পাতা পুনর্মুদ্রণ করলাম –যথাযথ বানান সহ।

১৯০৮ ... এই সময় একটা দুর্ঘটনায় আমাদের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। আমাদের একটা ছেলে বোমা ফাটীয়া মারা পড়ে। মানিকতলার সাব-ইন্সপেক্টর বাবুও মাঝে মাঝে বাগানে আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিয়া যাইতেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে বৃথাই সন্দেহ করিতাম। তিনি বাগানটিকে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচারীর আশ্রম বলিয়াই জানিতেন।

এই রকমে আরও একটা মাস কাটিল। শেষে মোজাফরপুরে বোমা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের পরমায়ু ফুরাইল।

... কোর্টে গিয়া দেখিলাম ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি (Birley) সাহেব বিকট বদনে উচুঁ তক্তের উপর বসিযা আছেন। মুখখানি যেন সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। দেখিলে মনে হয় যেন একটি মূর্তিমান শাসনযন্ত্র। তিনি আমাদের Statement-গুলি লিখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– 'তোমরা কি মনে কর তোমরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে পার?"

কথাটা শুনিয়া এত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসি আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম – সাহেল, দেড়শ বৎসর পূর্বে কি তোমরা ভারত শাসন করিতে? না তোমাদের দেশ হইতে আমরা শাসনকর্তা ধার করিয়া আনিতাম?

সাহেবের বোধ হয় উত্তরটা তত ভাল লাগিল না। তিনি খবরের কাগজের সংবাদ দাতাদের বারণ করিয়া দিলেন যে, আমাদের সহিত তাঁহার এই সমস্ত কথাবার্তাগুলা যেন ছাপা না হয়।

কোর্ট হইতে গাড়ী বন্ধ হইয়া যখন আলিপুর জেলের দরজার কাছে হাজির হইলাম তখন সন্ধ্যা। জেল তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অন্ন-ব্যঞ্জনও প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জেলার বাবু কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক এক মুঠা ভাত ও একটু করিয়া ডাল আমাদের খাইতে দিলেন। প্রায় দুইদিন অনাহারের পর সেই একমুঠা ভাতই যেন অমৃত বলিয়া মনে হইল।

... অরবিন্দ বাবু, দেবব্রত ও বারীন্দ্র ভিন্ন আর সকলেই এই হট্টগোলে যোগ দিত; তবে মধ্যে মধ্যে উহারাও যে বাদ পড়িতেন –তাহা নহে। ধরা পরিবার পর বারীন্দ্রের মনে কোথায় একটা বিষম ধাক্কা লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; সে প্রায় সমস্ত দিন একখানা চাদর মুড়ি দিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিত। দেবব্রত সকালে উঠিযা পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া সেই যে অচলপ্রতিষ্ট হইয়া বসিত, বেলা দশটা পর্যন্ত তাহাকে আর নাড়িবার উপায় ছিল না। আহারাদির পর আবার বেলা চার পাঁচটা পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা গীতা ও ভাগবত পড়িত। তাহার সময় এইরূপেই কাটিয়া যাইত। অরবিন্দ বাবুর জন্য একটা কোণ নির্দিষ্ট ছিল। সমস্ত প্রাতঃকাল তিনি সেইখানেই আপনার সাধন ভজনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও কোন কথা কহিতেন না। অপরাহ্নে দুইতিন ঘন্টা পায়চারী করিতে উপনিষদ বা অন্য কোনও ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। তবে সন্ধ্যাবেলায় এক আধ ঘন্টার জন্য ছেলেখেলায় যোগ না দিলে তাঁহারও নিষ্কৃতি ছিল না।

কানাইলাল প্রভৃতি চার পাঁচজন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত। রাত ১০টা ১১টার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, কার বা বিস্কুট লুকান আছে তাহার সন্ধান করিযা ফিরিত। যে দিন সে সব কিছু মিলিত না, সে দিন এক এক গাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা বা কাহারও কাণের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুন্নমনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় ১টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি কানাই একজনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দ বাবু পাশেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দ বাবু চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন; নিদ্রাভঙ্গের আর কোনও লক্ষণই দেখা গেল না! চুরিও ধরা পড়িল না!

রবিবারে আমাদের স্ফূর্তির মাত্রা একটু বাড়িয়া যাইত। আত্মীয় স্বজন ও বাহিরের অনেক লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন সুতরাং অনেক প্রকার সংবাদাদি পাওয়া যাইত। মিষ্টান্নও যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত। বিপুল হাস্যরসের মাঝে মাঝে একটু আধটু করুণ রসও দেখা দিত। শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কি রকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞাসা করায় শচীন লপ্সীর নাম করিল। পাছে লপ্সীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া তাহার পিতার মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে শচীন লপ্সীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল – 'লপ্সী খুব পুষ্টিকর জিনিস!' পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন – 'বাড়ীতে ছেলে আমার পোলাওএর বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লপ্সী তার কাছে খুব পুষ্টিকর জিনিস!" ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা তখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাষ যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়ত এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিযা তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলা আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্ত্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল!

এইরূপে ত সুখে দুঃখে জেলখানায় আমাদের দিন কাটিতে লাগিল; ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারও আরম্ভ হইয়া গেল। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য; আদালতে উকিল ব্যারিস্টারের ছড়াছড়ি; কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য নাই। সবটাই আমাদের চোখে একটা প্রকান্ড তামাসা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কত রকম বেরকমের সাক্ষী আসিয়া সত্য মিথ্যার খিচুড়ী পাকাইয়া যাইত; আমরা শুধু শুনিতাম আর হাসিতাম। তাহাদের সাক্ষ্যের সহিত যে আমাদের মরণ বাঁচনের সম্বন্ধ এ কথাটা মনেই আসিত না। স্কুল ছুটির পর ছেলেরা যেমন মহাস্ফূর্তিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, আমরাও সেইরূপে আদালত ভাঙ্গিবার পর গান গাইতে গাইতে চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতাম। তাহার পর সন্ধ্যার সময় যখন সভা বসিত তখন বার্লি সাহেব কি রকম ফিরিঙ্গি-বাঙ্গালায় সাক্ষীদের জেরা করে, নর্টন সাহেবের পেন্টুলানটা কোথাও

ছেঁড়া আর কোথায় তাল লাগান, কোর্ট ইন্‌স্‌পেকটরের গোঁফের ডগা ইঁদুরে খাইয়াছে কি আরসুলায় খাইয়াছে – এই সমস্ত বিষয়ে উল্লাসকর গভীর গবেষণা করিত; আর আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতাম। কিন্তু এই হাসি পর্বের পর যে একটা প্রকান্ড কান্না পর্ব আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝি নাই।

নরেন্দ্র গোস্বামীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আমরা যাহা ভয় করিয়াছিলাম, ফলে তাহাই হইল। বিচার আরম্ভ হইবার দুই চারি দিন পরেই সে সরকারী সাক্ষী হইয়া কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সাক্ষ্যের ফলে চারিদিকে নূতন নূতন খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। আর পন্ডিত হৃষীকেশের ঊর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত মারাঠি ও মাদ্রাজী নেতৃবৃন্দকে আবিষ্কার করিবার জন্য পুলিশ চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

নরেন সরকারী সাক্ষী হইবার পরই তাহাকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া হাসপাতালে ইউরোপীয় প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল। পাছে কেহ তাহাকে আক্রমণ করে সেই ভয়ে জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্বদাই সাবধান হইয়া থাকিতেন। জেলার বেচারী একদিন বলিলেন– ''দেখুন, আমার হয়েছে তালগাছের আড়াই হাত। তালগাছ সবটা চড়া যায়, কিন্তু শেষ আডাই হাত ওঠবার সময় প্রাণটা বেরিয়ে যায়। এতদিন চাকরী করে এলুম, বেশ নির্বিবাদে কেটে গেল। আর এই পেন্‌সন নেবার সময় আপনাদের হাতে গিয়ে পড়েছি। এখন মানে মানে আপনাদের বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।' কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস! তালগাছে শেষ আড়াই হাত আর তাঁহাকে চড়িতে হইল না।

ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের মোকর্দ্দমা সেসনে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আমরাও লম্বা ছুটি পাইলাম। নিষ্কর্মার দল – কাজেই সকলেই হাসে, খেলে, লাফালাফি করে, মোকদ্দমার ফলাফল লইয়া মাঝে মাঝে বিচার বিতর্কও করে। ছেলেরা কাহাকেও বা ফাঁসিকাঠে চড়ায়, কাহাকেও বা খালাস দেয়। কানাইলাল একদিন বলিল 'খালাসের কথা ভুলে যাও, সব বিশ বছর করে কালাপানি।' শচীনের তাহাতে ঘোরতর আপত্তি। সে প্রমাণ করিতে বসিল যে বিশ বৎসরের মধ্যে দেশ মুক্ত হইবেই হইবে। কানাইলাল খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল– 'দেশ মুক্ত হোক আর না হোক, আমি হবো। বিশ বছর জেলখাটা আমার পোষাবে না।' এই কথার দুই একদিন পরেই একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ পেটে হাত দিয়া শুইয়া পড়িয়া সে বলিল যে তাহার পেটে ভারি যন্ত্রণা হইতেছে। ডাক্তার বাবু আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি সে হাসপাতালেই রহিয়া গেল। মেদিনীপুরের সত্যেনকে কিছু দিন পূর্বে পুলিশ ধরিয়া আনিয়াছিল। কঠিন কাশরোগগ্রস্থ বলিয়া সেও হাসপাতালেই থাকিত।

(অষ্টম পরিচ্ছেদ)

শুধু কাজ লইয়া যাহাদের একতার বাঁধন, কাজ ফুরাইলেই তাহাদের একতাও ফুরাইয়া আসে। ধরা পড়িবার পর আমাদের কতকটা সেই দশা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা বিপ্লবপন্থী তাঁহারা সকলেই এক ভাবের ভাবুক নহেন। দেশে পরাধীনতা দূর হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু স্বাধীন হইবার পর দেশকে কিরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তাহার পর আমরা যে ধরা পড়িলাম, তাহা কতটা আমাদের নিজেদের দোষে, আর কতটা ঘটনাচক্রের দোষে – তাহা লইয়াও আমদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলিত! বাহিরে কাজকর্মের তাড়ায় যে সমস্ত ভেদ চাপা পড়িয়া থাকিত, ধরা পড়িবার পর তাহা ফুটিযা বাহির হইতে লাগিল।

একদল শুধু ধর্ম্মচর্চা লইয়াই থাকিতেন; আর যাঁহারা রাজনীতির উপাসক তাহারা ঐ দলকে ঠাট্টা করিয়া দিন কাটাইতেন। ঐ সময় আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র 'ভক্তিতত্ত্ব কুজ্ঝটিকা' কথাটার সৃষ্টি করেন। হেমচন্দ্রের বিশ্বাস যে ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিলে মানুষের বুদ্ধি ঘোলাটে হইয়া যায়, আর সে কাজের বাহির হইয়া পড়ে। ডাকের মধ্যে বসিয়া উভয় দলেরই প্রচার কার্য চলিত। দেবব্রত ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন; হেমচন্দ্র ধার্ম্মিকদিগের নামে ছড়া ও গান বাঁধিতেন। বারীন্দ্র এককোণে দুএকটি অনুচর লইয়া কখনও ধর্ম্মালোচনা করিত। কখনও বা চুপ করিযা পড়িয়া থাকিত। আমি উভয় দলেরই রসাস্বাদন করিয়া ফিরিতাম।

এই হট্টগোল ও দলাদলির মদ্যে একবারে নিশ্চল স্থানুর মত বসিয়া থাকিতেন– অরবিন্দ বাবু। কোন কথাতেই হ্যাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন! ভাত খাইবার সময় আরসুলা, টিকটিকি ও পিঁপড়াদের ভাত খাইতে দেন; স্নান করেন না, মুখ ধোয়া না, কাপড় ছাড়েন না –ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কুলাইত না। মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিলাম যে অরবিন্দ বাবুর চুল যেন তেলে চক্‌চক্‌ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম– 'আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল দেন?' অরবিন্দ বাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন– 'আমি ত স্নান করি না!' জিজ্ঞাসা করিলাম –'আপনার চুল অত চক্‌চক্‌ করে কি করিয়া?' অরবিন্দ বাবু বলিলেন– 'সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কতকগুলা পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমার শরীর হইতে চুল বসা (fat) টানিয়া লয়।'

দুই একজন সন্ন্যাসীর ওরূপ হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝি নাই। তাহার পর ডাকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে অরবিন্দ বাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে চিত্তের বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই একজনকে তাহা দেখাইলাম; কিন্তু কেহই অরবিন্দ বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল –'আপনি সাধন করে কি পেলেন?' অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটির কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন– 'যা খুঁজছিলাম, তাহা পেয়েছি।

তখন আমাদের সাহস হইল, আমরা তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলাম। অন্তর্জগতের যে অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিলাম তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা নহে; তবে এই ধারণাটি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনে একটা সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেলের মধ্যে বৈদান্তিক সাধনা শেষ করিয়া তিনি যে সমস্ত তান্ত্রিক সাধনা করিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক বিবরণ শুনিলাম। জেলের বাহিরে বা ভিতরে তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। এই সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন

জিজ্ঞাসা করায় অরবিন্দ বাবু বলিলেন যে একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্মশরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান। মোকর্দ্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন– 'আমি ছাড়া পাব'।

ফলে তাহাই হইল। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরে যখন রায় বাহির হইল তখন দেখা গেল সত্যসত্যই অরবিন্দ বাবু মুক্তি পাইয়াছেন। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির, আর দশজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। বাকি অনেকের পাঁচ সাত দশ বৎসর করিয়া জেল বা দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইল। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া উল্লাসকর হাসিতে হাসিতে জেলে ফিরিয়া আসিল; বলিল – 'দায় থেকে বাঁচা গেল।' একজন ইউরোপীয় প্রহরী তাহা দেখিযা তাহার এক বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন– Look look, the man is going to be hanged and he laughs! (দেখ, লোকটার ফাঁসি হইবে তবুও সে হাসিতেছে)। তাহার বন্ধুটি আইরিস; সে বলিল–Yes, I know; they all laugh at death (হ্যাঁ, আমি জানি; মৃত্যু তাহাদের কাছে পরিহাসের জিনিষ!)

১৯০৯-এর মে মাসে রায় বাহির হইল। আমরা পনের ষোল জন মাত্র বাকি রহিলাম; বাকি সবাই হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল। আমরাও তাহাদের হাসিতে হাসিতে তাহাদের বিদায় দিলাম; কিন্তু সে হাসির তলায় তলায় একটা যেন বুকফাটা কান্না জমাট হইয়া উঠিতেছিল। জীবনটা যেন হঠাৎ অবলম্বন শূন্য হইয়া পড়িল। পন্ডিত হৃষীকেশ মুর্ত্তিমান বেদান্তের মত বলিয়া উঠিলেন –'আরে কিছু নয়, এ একটা দুঃস্বপ্ন।' হেমচন্দ্র বুকে সাহস বাঁধিযা বলিলেন– 'কুচ্ পরোয়া নেহি; আমিও সকলকার দেখাদেখি হাসিলাম; সেজদা (অরবিন্দ) বলে দিয়েছে ফাঁসী আমার হবে না।' আমিও সকলকার দেখাদেখি হাসিলাম, কিন্তু বীরের মন যে ধাতু দিয়া গঠিত হয়, আমার মন যে সে ধাতু দিয়া গঠিত নয় তাহা এইবার বেশ ভাল করিয়াই দেখিতে পাইলাম। মনটা যেন নিতান্ত অসহায়, বালকের মত দিশেহারা হইয়া উঠিল। বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাইয়া দিতে হইবে! উঃ! এর চেয়ে ফাঁসী ছিল ভাল। ভগবানের দোহাই দিয়া যে নির্বিবাদে দুঃখকষ্ট হজম করিব যে উপায়ও আমার ছিল না। ভগবানের উপর বিশ্বাসটা অনেক দিন হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ছেলেবেলা একবার বৈরাগ্যের ঝুলি কাঁধে লইয়া সাধু সাজিতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন ভগবানের উপরে ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব বেশ একটা ছিল। মায়াবতীর মাঠে স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট নির্গুণ ব্রহ্মবাদে দীক্ষিত হইবার পর ধীরে ধীরে সে ভক্তি ও বিশ্বাস কোথায় উড়িয়া গেল!

প্রহরীদের মধ্যে সকলেই আমাদের জব্দ করিবার চেষ্টায় ফিরিত কিন্তু দু'একজন বেশ ভালমানুষও ছিল। আমাদের মধ্যে যাহার সাজা খাইতে তাহাদের জন্য একজন ইউরোপীয় প্রহরীকে পকেটে করিয়া কলা লুকাইয়া আনিতে দেখিয়াছি। চুপি চুপি কলা খাওয়াইয়া বেচারা পকেটে পুরিয়া খোসাগুলি বাহিরে লইয়া যাইত।

একজন লম্বা চৌড়া হাইলান্ডার প্রহরী মাঝে মাঝে আমদের জ্বালাতন করিয়া আপনার প্রহরী জন্ম সার্থক করিত। আমরা তাহার নাম দিয়াছিলাম 'Ruffian warder'; মাঝে মঝে সে আমাদের বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিত যে সে ও তাহার স্বজাতিরা ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। কিন্তু সকলের চেয়ে মিষ্টিমুখ সয়তান ছিল চিফ্ ওয়ার্ডার স্বয়ং। সে আবার মাজে মাঝে ধর্মের তত্ত্বকথাও আমাদের শুনাইত; এবং আশা দিত যে জীবনের বাকি কয়টা দিন সৎ হইয়া চলিলে স্বর্গে গিয়া আমরা ইংরাজের মত ব্যবহারও পাইতে পারি। হায়রে ইংরেজের স্বর্গ! জেলখানার মধ্যে গালাগালি, মারামারি সবই সহ্য হয়; কিন্তু ইহাদের মুখে ধর্ম্মের বক্তৃতা সহ্য করা দায়।

আমাদের মধ্যে হেমচন্দ্র চিত্র-বিদ্যায় বেশ নিপুণ। তিনি দেওয়ালের শ্যাওলা, চুণ ইটের গুড়া ঘসিয়া নানারূপ রং প্রস্তুত করিয়া সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়ালের গায়ে গায়ে আঁকিয়া রাখিতেন। প্রহরীদের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য মাঝে মাঝে কাগজের উপর নখ দিয়া নানারূপ ছবিও তাহাদিগকে আঁকিয়া দিতেন।

যাঁহারা চিত্রবিদ্যায় নিপুণ নন, তাঁহারা মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে কবিতা লিখিয়া মনের খেদ মিটাইতেন। একদিন এক কুঠরীর মধ্যে গিয়া দেখিলাম, একজন অজ্ঞাতনামা কবি দেওয়ালের গায়ে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন–

ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হৈল কালি।
প্রহরী যতেক বেটা বুদ্ধিতে ত বোকা পাঁটা
দিন রাত দেয় গালাগালি।

মাঝে মাঝে এক আধটা বেশ ভাল কবিতাও নজরে পড়িত। আমার মনের ফাঁদে কবিতা প্রায় ধরা পড়ে না; কিন্তু এই দুই ছত্র কিরূপে আটকাইয়া গিয়াছিল–

''রাধার দুটী রাঙ্গা পায়
অনন্ত পড়েছে ধরা–
উঠে বসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা''

হায়রে মানুষের প্রাণ! জেলের কুঠুরীর মধ্যে বন্ধ থাকিয়াও রাধার দুটী রাঙ্গা পায় আছাড় খাইয়া পড়িতেছে!

সেসন্স কোর্টে রায় বাহির হইবার পর হইতেই হাইকোর্টে আমাদের আপিলের শুনানি চলিতে ছিল। নভেম্বর মাসে রায় বাহির হইল। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম বন্ধ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইল। অনেকের কারাদন্ডও কমিয়া গেল, কেবল হেমচন্দ্রের ও আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দন্ড পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

পাছে দড়ি পাকাইয়া ফাঁসি খাই সেই ভয়ে আমাদের পাট ছিঁড়িতে দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই যাহারা দ্বীপান্তর দন্ডে দন্ডিত, তাহারা ভিন্ন অপর সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আমরা আন্দামানের জাহাজের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম।